মিথলজিস্ট সুকুমার সেন

বীতশোক ভট্টাচার্য

দু খন্ডের শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির প্রথম খন্ডের শেষ পাতায় আছে মিথলজি শব্দটি। আর সুকুমার সেন তঁার দুই পর্যায়ে লেখা জীবনচরিত দিনের পরে দিন যে গেল বই-এর শেষ পাতায় মিথলজির প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। প্রাচীনদের কেউ কেউ সাইথলজি বলেন, সুকুমার সেন মিথলজি বলতেন। পুরাণ মিথ-এর চেয়ে জোরালো শব্দ, যা নতুন হতে থাকে তাই পুরাণ, কিন্তু পুরাণ বললে পাছে ইতিহাসের থেকে আলাদা ব্রাহ্মণ্য-কাহিনী-পরম্পরা বোঝায় হয়তো তাই সুকুমার সেন পুরাণের বদলে শব্দটি ব্যবহার করে গিয়েছেন, স্পষ্টতার দাবি আর স্বচ্ছতার দাবিই তাঁর সব থেকে বড়ো দাবি, এক্ষেত্রেও। জীবনচরিতে নূন্যকথন থাকতে পারে, সুকুমার সেনের আত্মকথায় ঊনকথন আছে। তিনি লিখেছেন যে, ভাষাবিদ্যার অধ্যাপনকর্ম হতে অবসর নেওয়ার পরে, বেশ কিছু পরে, তিনি মিথলজির চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ইতিহাসের দিক থেকে তাঁর এ কথা ঠিক নয়, কারণ ১৯৪০-এ প্রকাশিত তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বই-এর পাতা উলটে যাওয়া অলস পাঠকও বুঝতে পারবেন গোড়া থেকেই মিথলজি বিষয়ে সুকুমার সেনের আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল, পরে-চর্চার সময় ও সুযোগ তিনি বেশি পেয়েছেন, মিথলজি এই বিচিত্রগামী মনীষার মন কেড়ে নিয়েছে।

ভাষা যাঁর চর্চার বিষয় মিথলজিও তাঁর চর্চার বিষয় হওয়া স্বাভাবিক। ভাষাবিদ্ শব্দ নির্ভর ক'রে মানবিকীবিদ্যার এক একটা বৃত্ত রচনা করতে পারেন। সে-বৃত্তের পরিধিতে থাকে সমাজবিজ্ঞান প্রত্নতত্ত্ব প্রতিমামানলক্ষণ শাস্ত্র তৌলন-ধর্মতত্ত্ব এইসব বিচিত্র বিদ্যার চাপ। যা কিছু মানুষের তা জানতে না পারলে আমিই খন্ডিত রেনাসেন্সের মানুষ এই বোধে সত্যই পৌঁছতে চেয়েছিল, আর বাংলার নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে তেমন পুনর্জ্জীবনের যুগ হোক বা না হোক, সে-সময় এই বোধ বাঙালি মণীষাকে পেয়ে বসেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও রচনা ঐ পূর্ণতায় ঐ সম্পূর্ণতায় পৌঁছনোর শেষ আয়াসরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। গু সুনীতিকুমারের দেখানো পথে তিনি মিথলজি চর্চার ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছেন এ-কথা বলে গিয়েছেন সুকুমার সেন নিজেই। একটি বিশেষ সময়ে তাঁর একথা বলবার একটি পটভূমি আছে। সুকুমার সেনের পাঠের প্রস্তুতি তার পৃষ্টপট রচনা করেছে। ইন্দো-য়োরোপিয় ভাষাতত্ত্ব তাঁর বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহের তুলনাত্মক অভিধান প্রণয়ন করে ছিলেন টারনার। আর সুকুমার সেন ইন্দো-য়োরোপিয় ভাষাবর্গের তুলনামূলক মিথলজির একটি কোষ প্রস্তুত করছিলেন বলা যায়। পাশ্চাত্যের ক্লাসিকাল ভাষা ও কয়েকটি পশ্চিমি ভাষায় তাঁর অধিকর, সেই সঙ্গে সংস্কৃতের প্রাক্-ইতিহাস ও উত্তর-ইতিহাসে তাঁর ব্যুৎপত্তি এক্ষেত্রে তাঁর সহায় ছিল।

ম্যাক্সমুলার কাব্যগত মিথ বা ভালোমন্দ-অনপেক্ষ মিথ আর কল্পকথার মিথ বা বানানো গল্পের মিথের মধ্যে পার্থক্য আছে দেখিয়েছিলেন। সুকুমার সেন যখন আসরে এলেন তখন ঐ মিথচর্চার শতবর্ষ পার হয়ে গিয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতো পন্ডিতেরা বিজ্ঞানমনস্ক শব্দশাস্ত্রীরা বাংলা মিথলজি চর্চার ধারায় একটি নতুন বাঁক আবিষ্কার করেছেন। পাশাপাশি ইংরিজিতে সাধারণ পাঠকের জন্যও এ-মিথলজিতে প্রবেশের ভূমিকা রচিত হয়ে চলেছে। হাইনরিখ জিমারের ভারতের শিল্প ও সভ্যতায় মিথ ও সিম্বল বিষয়ক দু'খন্ডের সচিত্র গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্যপুরাণের প্রধান পাঠ্যবই রূপে প্রকাশ পেয়েছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে। তারপর আর. কে. নারায়ণ এবং জেমস কার্ক-এর কাজ

উল্লেখের যোগ্য। তারপরে ওয়েন্ডিও'ফ্ল্যহার্টির হিন্দু মিথ বিষয়ক বইটির নাম করতেই হয়। ইতিহাসের ধারায় বেদ রামায়ণ মহাভারত ও মহাপুরাণ সমূহের নির্ভরে রচিত ও পেংগুইন হতে প্রকাশিত এ বইটিতে এই মহিলার প্রাঞ্জল ও বিশদ গবেষণাকর্ম ইংরিজি জানা সামান্য পাঠকের বন্ধু হয়ে উঠেছিল। ভারতের আরও দু'জন মহিলার কথা এ সূত্রে বলা দরকার। তাঁরা হচ্ছেন ইরাবতী কার্ভে ও রমিলা থাপার। বিদেশি ভারতবিদেরা তো ছিলেনই, তাছাড়া সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকেরা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বৃহৎ পরম্পরার জালে আমাদের ছোট ছোট কৌম সংস্কৃতিকেও বদ্ধ করবার ক্রমিক উন্মুখতা ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মানসে সঞ্চারিত ক'রে চলেছিলেন। কিন্তু মহাপুরাণের মহাধারা সম্পর্কে সংস্কৃত-না-জানা পাঠকের সেভাবে জানবার উপায় ছিল না, উপায় এখনও যে পুরোপুরি আছে তা বলা যাবে না। সব মিলিয়ে অবিশেষজ্ঞের কাছে ভারতের পুরাণস্থাপত্য মুগ্ধ করবার মতো স্বমহিম ও বিমূঢ় করবার মতন সুন্দর এক নির্মাণকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজশেখর বসু সাধারণ পাঠককে ক্লান্তি দূর ক'রে অভয় দিতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যে সুকুমার সেনের সারগর্ভ সহজ ও ছোট ছোট কয়েকখানি বই বাঙালি পাঠকের সঙ্গী হয়ে উঠল।

রামকথা প্রাক্-ইতিহাস, ভারতকথার গ্রন্থিমোচন এই বই দুটি সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত এই ধ্রুপদী ও চিরায়ত পাঠ্যবস্তুর পুরাণের বিরাট জটিল ষড়যন্ত্র থেকে বাঙালি পাঠককে উদ্ধার করতে চেয়েছে। এ কর্ম সহজ ছিল না। দেখা গেল ভারতের নানা ভাষায় সব মিথ ছড়ানো রয়েছে, ভারতের বাইরের নানান দেশেও এসব মিথ রূপ পেয়েছে, ভারতের শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত দুটি ধারাতে কোথাও মিলে গিয়ে কোথাও বা আলাদা ভাবে এসমস্ত মিথের স্রোত বইছে, মৌখিক ও লৈখিক সাহিত্য ছাড়াও ভাস্কর্য থেকে সংগীত পর্যন্ত নানা বাহনে এই সমস্ত মিথ চলেছে, এদের এক একটি উৎসে উজিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসাধ্য কাজ। সুকুমার সেন সেই অসাধ্যের সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। দালম্যান ভিন্তারনিৎজ প্রমুখ পুরোনো মিথ আলোচকদের রচনার সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় ছিল। দুমেজিল, মির্চা এলিআদ ও ওয়ালটার বেন প্রমুখের নতুনতরো রচনার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হলো। এর মধ্যে মিথের আলোচনার ক্ষেত্রে ঋতুবদল ঘটেছে। সুকুমার সেনের রবীন্দ্রসাহিত্য বিচারের পদ্ধতি বুঝিয়ে দেয় মিথ ও সিম্বলের মিলিত বিবেচনায় ঝোঁক পড়বার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইংরিজি সাহিত্য সমালোচনায় মিথ ও আর্কিটাইপের যে বাঁধা পথটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল সুকুমার সেন সে-পথের পথিক ছিলেন না। ফলে বডকিন ও নর্থর্প ফ্রাই-এর সমালোচনা প্রণালী তাঁর কাজে লাগে নি। সুকুমার সেন জানিয়েছেন মিথলজি চর্চার ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমি পন্ডিতদের প্রদর্শনীয় পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। এই দিকে তাঁকে দর্শনী দিয়েছেন মনে হয় ক্লদ লেভি-স্ত্রস। সুকুমার সেন লেভি-স্ত্রসের মতো দুর্দান্ত পন্ডিত, কিন্তু লেভি-স্ত্রসের রচনার মতো বিমূঢ়তা উৎপাদনকারী জটিলতা তাঁর রচনায় নেই। বঙ্গভাষী সাধারণ পাঠকের কথা বিবেচনা ক'রে অথচ মিথসংক্রান্ত আলোচনার গুত্বকে যথোচিত স্বীকৃতি দিয়ে তিনি এই জাতীয় বই লিখেছেন। মিথের কাঠামো মানবতার মনের গড়নটি ধরিয়ে দিতে চায়, এ বিষয়ে লেভি-স্ত্রসের সঙ্গে সুকুমার সেন একমত। দু'জনেই মিথলজির একটি সামগ্রিক পদ্ধতি বা তন্ত্র আবিষ্কারে তৎপর এবং দ্বিক সম্পর্কে বা বিরোধিতায় বিন্যস্ত বর্গসমূহের নানান জোড়ের জট খোলার কাজে দুজনের চলনের মিল চোখে পড়ার মতো। লেভি-স্ত্রসের মতো সুকুমার সেনও মিথের সাংগঠনিক আলোচনায় শব্দার্থতত্ত্বকে সবিশেষ গুত্ব দিয়েছেন। লেভি-স্ত্রসের আদর্শ সুকুমার সেনের অনুসৃত রচনায় সহজভাবে দেখা দিয়েছে, কাটা-কাটা ভঙ্গিতে লেখা ছোট ছোট যুক্তিনিষ্ঠ সহৃদয় বাক্যে সুকুমার সেন যা বোঝাতে চেয়েছেন তাতে অপরিচয়ের দূরত্বজনিত বিহ্বলতা নেই, তবে বিষয়ের প্রতি নাছোড় ও একমুখী ক্ষিপ্রতায় ধাবমান লেখকমনের পক্ষে স্বাভাবিক সেই উল্লম্ফন আছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে প্রথম পাঠে বেগ পেতে হয়। যৌথ পরিবার প্রথায় লালিত বাঙালি-মন লেবি-স্ত্রসের আত্মীয়তার গড়নের মধ্যেকার জটিলতাকে সহজ করে নিতে পেরেছে, তাতে সুকুমার সেনের কাজ আরও সহজ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। ফ্রেজার-এর গোল্ডেন বাও সুকুমার সেন নিশ্চয় পড়েছিলেন, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন এর আদিম সমাজ বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সঙ্গেও সম্ভবত তাঁর পরিচয় ছিল, কিন্তু রলাঁ বার্ত-এর রচনা তাঁকে আকর্ষণ করত না বলে মনে হয়। শেষ কথা, সুকুমার সেন যেকালে এদেশে মিথলজি চর্চার এমন সূত্রপাত করেছেন সেসময় ভারতে ইন্দো-য়োরোপিয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক মিথলজির চর্চার এই প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল।

সুকুমার সেন রামায়ণের পর রূপকথায় পর মহাভারতে এবং মহাভারতের পর দেবদেবীর পূর্বরকথায় মনোযোগ করেছিলেন। রামকথার উদ্ভব ও বিকাশ নামে ইংরিজিতে তাঁর একটি চটি বই আছে, সঙ্গত কারণে তিনি সে বইটি তাঁর গু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। সুনীতিকুমারের রামাযণ বিষয়ক একটি বক্তৃতা তাঁর মৃত্যুর পর গ্রন্থাক ারে প্রকাশ পেয়েছিল এবং সুকুমার সেন সে-গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ১৯৭৫-এ দিল্লিতে রামায়ণ বিষয়ে দ্বিতীয় আন্তজার্তিক আলোচনা চত্রের আয়োজন করা হয়েছিল। রামায়ণের পরম্পরা ও বৈচিত্র্য বিষয়ক দুটি গ্রন্থে সা হিত্য অকাদেমি ঐ উপলক্ষে রচিত ঐ সব প্রবন্ধ সংগ্রন্থিত করেছিলেন। পরের বৎসরের গোড়ার দিকে সুনীতিকুমারের এশিয়াটিক সোসইটিতে রামায়ণের ঐতিহাসিকতা বিষয়ে একটি বক্তৃতা সব পাঠকের মন সমানভাবে জয় করতে পারেনি। পরের মাসে ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে তাঁর ঐ বিষয়ে আর একটি বক্তৃতাও শ্রোতার কাছে মনোহারী হয়ে ওঠে নি। ভাই বে ান রামসীতার বিবাহ বিষয়ে একটি জাতকগাথার উল্লেখে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা অকারণে আহত বোধ করেছিলেন। ঐতিহা সিক দীনেশচন্দ্র সরকারও ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও তৌলন সাহিত্য আলোচকের যুগ দৃষ্টিকে াণ থেকে সুনীতিকুমার রামায়ণকে আর্য ও অন্-আর্যভাষীদের নানা মিথের এক যৌগ বা সংশ্লেষণরূপে গণ্য করেছিলেন এবং সুকুমার সেন তাঁর গুর প্রদর্শিত সে পথ ধরে তাঁর রামায়ণের আলোচনায় উপনীত হয়েছেন। সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষ ায় রচিত রামকথা সমূহ যে য়োরোপে ও এশিয়ায় প্রকীর্ম ও প্রাচীন নানা মিথের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা তাঁর মনোগ্র াফের বিষয়।

বেদে রাম ও সীতার যে উল্লিখন আছে তা সুকুমার সেন আলোচনা করেছেন। মহাভারতে রামকথা কি রূপ পেয়েছে, রাম ায়ণ মহাভারতের তুলনায় প্রাচীন কিনা তাও এ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। উত্তরাকান্ড বাল্মীকির রচনা কিনা, কালিদ াসের রঘুবংশ রচনার পর উত্তরাকান্ড রচিত হয়েছিল নাকি, এ জাতীয় সমস্যার গিঁট খুলতে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। চ্যবনের কথা ও বাল্মীকির কথার সঙ্গে রামায়ণের যোগসূত্রের অন্বেষণ এ রচনার আর একটি প্রসঙ্গ। পালিতে রামকথার বিবেচনা আছে এখানে, আরো আছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং খোটানে চীনে রামকথার আলোচনা। কোসাম্বি দেখিয়েছিলেন চীনের মিথ থেকে হনুমান কিভাবে রামায়ণে এসে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন; সুকুমার সেন অবশ্য রামকথার চৈনিক অনুবাদের প্রসঙ্গ পেড়েছেন।

সুনীতিকুমারের মতন সুকুমার সেনও রামায়ণ আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। ভাষা ও ছন্দ জ াতীয় দু-একটি কবিতার কথা বাদ দিলে রবীন্দ্ররচনায় মহাভারতের মিথের পুনর্নির্মাণই বোধহয় বেশি। আশুতোষ মুখোপ াধ্যায় জাতীয় সাহিত্য আলোচনায় রামনারায়ণকে যথাস্থান দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও, তবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের রামায়ণ নয়, কালীপ্রসন্ন সিংহেরমহাভারত উনিশ শতকের এবং বিশ শতকের গোড়ার দিককার বাঙালি মানসকে শাসন করেছে। ভারতকথার গ্রন্থিমোচন বইটিতে সুকুমার সেন ঐ মহারণ্যে প্রবেশ করেছেন, প্রবেশ করেছেন অক্লিষ্ট নির্ভয় ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি তে। এটি যে পুরোপুরি বিদ্যাচর্চার ব্যাপার এবং এতে যে প্রাচীন ধর্মসৌধের ওপর কোনও আঘাত হানা হচ্ছে একথা ভূমিকাতেই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্বে বিচার ক'রে একটি দ্বিস্তর আখ্যায়িকারূপ মহ াভারতের বিচারে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। এক্ষেত্রে কুপান্ডবের বিরোধ যেমন তেমনি কু পান্ডব নামের উৎস, বিদুর শিখন্ডা প্রমুখের ভূমিকা এসবও তাঁর বিবেচনার বিষয় হয়েছে। গীতা কেন অষ্টাদশ অধ্যায়ের — এ প্রশ্নের মোহমুক্ত উত্তর দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন ঐতিহাসিক কোসাম্বি। সুকুমার সেন আঠারোকে যেন একটি ম্যাজিক নাম্বার রূপে দেখেছেন। ভ ারতীয় সাহিত্যে উর্বশী মিথের যে তিন হাজার বছরের একটি নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা আছে তার উল্লেখ তিনি প্রাচীন ভ ারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে আগেই করেছিলেন।

মিথের সূত্র ধরে রামায়ণ মহাভারতের নতুন মূল্য অঙ্কণ করতে গিয়ে পাছে ব্রাহ্মণ্যধর্মে আঘাত হানেন সে বিষয়ে সুকুমার সেনকে সতর্ক থাকতে হয়েছিল। এমনকি ভাগবত বা হরিবংশ আলোচনাতেও এই ভয় ছিল। আর এক লক্ষ শ্লোকের মহাভ ারত পাঠ যদিও সম্ভব এক কোটি শ্লোকের পুরাণ পাঠের প্রস্তাবটি ভীতিজনক। সুকুমার সেন যখন এসমস্ত আলোচনা

করেছেন তখন সব পুরাণের অনুবাদ হয় নি এবং সে সব পুরাণের নির্ভরযোগ্য কোনও সারসংক্ষেপও ছিল না। দক্ষিণ ভারতীয় মিথ এবং মহাভারতের লোকায়ত মিথের আলোচনাতেও তিনি তুলনায় সসঙ্কোচ ও সন্তর্পণ।

দি গ্রেট গডেসের ইন ট্রাডিশন গ্রন্থটি সুকুমার সেন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর বৈয়াকরণ বন্ধু এস. এম. কত্রে'কে। কত্রে যেমন পাণিনিকে পাশ্চাত্যের আধুনিক পাঠকের উপযোগী ক'রে উপস্থাপিত করেছেন তেমনি ভারতীয় স্ত্রীদেবতাদের বিচিত্র পরিচয় এখানে পরিবেশিত। মানবরূপ ও পশুরূপ ধারিণী দেবী, স্থান ও নদীনাম সূচক দেবী, সম্মানবাচক ও বর্ণনানির্ভর দেবীর নাম, মাতৃকানাম — এরকম নানা শ্রেণীতে বর্গীকরণ করে সুকুমার সেন ব্রাহ্মণ্য স্ত্রী-দেবতার একটি প্রয়োজনীয় কোশগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং সেইসঙ্গে ঋগ্‌বেদ হতে শু করে তন্ত্রপ্রভাবিত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সাহিত্যে প্রাপ্ত দেবীগণের পরিচয়ের একটি রূপরেখাও অঙ্কণ করে দিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বা পুপুল জয়াকরও ভারতীয় দেবীদের বিষয়ে আলোচনায় তাঁদের লেখার বিশেষ ঝোঁকের জোর নেই, কিন্তু এটি এমন এক ভিত্তিস্থানীয় কাজ যেখানে ব্রাহ্মণ্য ধারণায় দেবতার নারীরূপের বৈচিত্র্য ও বৈপুল্য ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক বিবেচনার বিষয় হয়েছে। সম্প্রতি স্ত্রী দেবতাদের বিষয়ে ইংরিজিতে অনেক গবেষণামূলক সন্দর্ভ রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে, সুকুমার সেনের বইটি সে ভিড়েও হারিয়ে যাওয়ার মতো কিছু নয়। হিন্দু ধর্মীয় পরম্পরায় দিব্য নারীর প্রতিমা পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন ডেভিড কিনসেল। তাঁর হিন্দু গডেসেস বইটির সঙ্গে এর তুলনা করলে বোঝা যায় পুরোনো ধারায় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের এ বইটি কি রকম মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য এক উৎসস্বরূপ; ভারতের স্ত্রীদেবতাদের জটিল এমনকি স্ববিরোধী এবং সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় এই সব নাম সুকুমার সেন ইংরিজি জানা অপরিচিত পাঠকের সমীপে প্রথম এনেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য ও মহাশ্বেতা দেবী দ্বিমত পোষণ করবেন হয় তো, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য হতে প্রাপ্ত স্ত্রীদেবতাদের পরিচয়ও সুকুমার সেন ঐ পটভূমিতেই দিয়েছেন। রামায়ণের মিথের সঙ্গে ফ্রিজিআন মিথের সম্ভাব্য যোগ দেখাতে তিনি অগ্রসর, কবিকঙ্কণ মুকুন্দকেও তিনি অভৃগুবংশের পরম্পরায় স্থাপন করে দেখাতে চান। ফ্রিজিআর মহাদেবী তাঁর কাছে দূর্গার হুবহু প্রতিরূপ, তাঁর মনে হয় কমলেকামিনীর কাহিনী তামিতুসের লাতিন রচনাতেও ছিল। সুকুমার সেনের এমনধারা উৎসসন্ধানে আর্যামির কোনো অভিসন্ধি আবিষ্কার না করতে চাওয়াই উচিত হবে। যে স্বচ্ছ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে তিনি ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের উৎস বেদে খুঁজে পান, সে উৎসাহেই তিনি সাঁওতালি লোককথায় এই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল অন্বেষণ করেন।

এই সূত্রে সুকুমার সেনের গল্পের ভূত বইটিরও আলোচনা হওয়া দরকার। পাশ্চাত্যে পরীর ধারণা প্রাচ্য থেকে গিয়েছে, কিন্তু ভারতের অপ্রাকৃত জীবদের — যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর অপ্সর বিদ্যাধরদের বিষয়ে পৃথক আলোচনা চোখে পড়ে না। এই বইটি সেই দিকে এক নতুন পথ খুলে দিয়েছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্যের পটে তিনি পেতনি, শাঁকচুন্নি, ডাইনি, রাক্ষস, খোক্কস, যখ, জিন, মামদো, ব্রহ্মদৈত্য, বেতাল, পিশাচ, যাতুধান প্রমুখ জীব এবং পশু-ভূতদের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই অনুষঙ্গে ড্রাকুলা ভ্যামপায়ার এদের কথাও তিনি বলে দিয়েছেন। ডাইনি সঙ্গত তবু ভিন্ন কারণে একাধিক গ্রন্থের বিষয় হয়েছে, কিন্তু বাকি সব চরিত্রের চিত্রণ এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। সুকুমার সেনের বইখানি সে অভাব প্রাথমিকভাবে পূর্ণ ক'রে সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিকের পিপাসা বাড়িয়ে দিয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী ও অশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রাক্ষস-খোক্ষস বই থেকে নেওয়া সব ভূতের ছবি এই থেকে একটি প্রায়-অলৌকিক প্রাপ্তি।

ভারত মিথলজি চর্চার এক অতি উর্বর এবং এক অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ক্ষেত্র। মিথের এমন প্রাচীন ও জীবন্ত সহাবস্থান বোধ করি আর অন্য কোনও ঐতিহ্যে নেই। পৌরাণিক চরিত্রের এমন প্রধান ভূমিকা সম্ভবত আর কোনও দেশের সমাজে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে এরকমভাবে পাওয়া যাবে না। ভারতবিদ্ সুকুমার সেন হিন্দুর ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে পুরাণকে মুক্ত ক'রে মিথলজির উদার আবহে মূলত ব্রাহ্মণ্য পরম্পরায় নিহিত সত্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং তাঁর মিথলজির আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে নয়, সংসক্ত সমীক্ষারূপে অধিক মূল্যবান।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com